দেশে পথদুর্ঘটনার হার কমাতে কেন্দ্র-রাজ্য যৌথ উদ্যোগ জরুরি

প্রতিদিন সংবাদপত্র খুললেই নজরে পড়ে যে কোথাও নয়ানজুলিতে পড়ে গেছে পড়ুয়া সমেত স্কুলবাস, কোথাও খাদে। আবার বেপরোয়া গাড়ি বা ট্রাক চলাচলে বহু মানুষের অত্যন্ত মর্মান্তিক মৃত্যু আমাদের ভারাক্রান্ত করে তোলে। এমন দুর্ঘটনায় স্বজনহারা হয় মানুষ। কেউ হারায় প্রিয়জনকে, কেউ পুত্র-কন্যাকে। দুর্ঘটনা যে শুধু স্কুলবাস, বাস, ট্রাক, লরির ক্ষেত্রে তাই নয়। দুর্ঘটনার শিকার হয় প্রবল গতিতে চলা মোটরবাইকও। এভাবে বছরে হাজার হাজার নারী, পুরুষ, শিশুর মৃত্যু হয়। এই মৃত্যু কাঙ্খিত নয়। এই মৃত্যু দুর্ভাগ্যজনক। এ কারণে পথদুর্ঘটনায় মৃত্যুর হার কীভাবে কমানো যায় তা নিয়ে গভীরভাবে ভাবনা করার সময় এসেছে। তাই কেন্দ্র-রাজ্যের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক এ নিয়ে যৌথ উদ্যোগ নিক, এটাই চায় দেশের মানুষ। গত সোমবার হিমাচল প্রদেশে এক ভয়াবহ দুর্ঘটনায় পড়ে স্কুলবাস। হিমাচল প্রদেশের কাংড়া জেলার নুরপুরে পাহাড় থেকে বাঁকের মুখে নিয়ন্ত্রণ হরিয়ে ২০০ ফুট নিচে খাদে পড়ে যায়। এই দুর্ঘটনায় হতভাগ্য ২৭ জন পড়ুয়ার মৃত্যু হয়েছে। এটা ভাবা যায় না। আবার পরের দিন অর্থাৎ মঙ্গলবার মুম্বইয়ে মুম্বই-পুণে হাইওয়েতে ভয়াবহ ট্রাক দুর্ঘটনায় ১৭ জন নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। এ ধরনের দুর্ঘটনার প্রধান কারণ গাড়ির বেপরোয়া গতি এবং পথনির্দেশিকা না মানা। সুতরাং মানুষের জীবনরক্ষায় চালকদের সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

অমৃত কথা

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রের আসিবার কথা ছিল, কিন্তু তিনি আসিতে পারেন নাই। ঈশান পেন্সন লইবার পর ঠাকুরের নিকট দক্ষিণেশ্বরে প্রায় যাতায়াত করেন ও ভাটপাড়াতে গঙ্গাতীরে নির্জনে মাঝে মাঝে ঈশ্বরচিন্তা করেন। সম্প্রতি ভাটাপাড়ার গায়ত্রীর পুরশ্চরণ করিবার কথা ছিল।

আজ শনিবার , ২২শে সেপ্টেম্বর ৬ই আশ্বিন, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈশানের প্রতি)—তোমার সেই গল্পটি বলত; ছেলে চিঠি পাঠিয়েছিল।

ঈশান (সহাস্য) --একটি ছেলে শুনলে যে ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন। তাই সে প্রার্থনা জানাবার জন্য ঈশ্বরকে একখানি চিঠি লিখে ডাকবাক্সে ফেলে দিছিল, স্বর্গ। (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—দেখলে ! এই বালকের মত বিশ্বাস। তবে হয়, (ঈশ্বানের প্রতি)—আর সেই কর্মত্যাগের কথা ?

ঈশান—ভগবান লাভ হলে সন্ধ্যাদি কর্ম ত্যাগ হয়ে যায়। গঙ্গাতীরে সকলে সন্ধ্যা করেছে, একজন করেছে না। তাকে জিজ্ঞাসা করায় সে বল্‌লে, আমার অশৌচ হয়েছে, সন্ধ্যা করতে নাই। মরণাশৌচ, আর জন্মশৌচ দুই-ই হয়েছে। অবিদ্যা মা'র মৃত্যু হয়েছে, আত্মরামের জন্ম হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আর **আত্মজ্ঞান** হলে জাতিভেদ থাকে না, সেই কথাটি ?

ঈশান -- কাশীতে গঙ্গাস্নান করে শঙ্করাচার্য সিঁড়িতে উঠেছেন্এমন সময় কুক্কুরপালক চণ্ডালকে সামনে দেখে বল্‌লেন, এই তুই আমায় ছুঁলি। চণ্ডাল বললে, ঠাকুর, তুমিও আমায় ছোঁও নাই—আমিও তোমায় ছুঁই নাই; আত্মা সকলেরই অন্তর্যামী আর নির্লিপ্ত। সুরাতে সূর্যের প্রতিবিম্ব আর গঙ্গাজলে সূর্যেব প্রতিবিম্ব এ দুয়ে কি ভেদ আছে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্য)—আর সেই সমন্বয়ের কথা, সব মত দিয়েই তাঁকে পাওয়া যায় ?

ঈশান(সহাস্য)—হরি-হরের এক ধাতু, কেবল প্রত্যয়ের ভেদ, যিনিই হরি তিনিই হর। বিশ্বাস থাকলেই হলো।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্য)—আর সেই কথাটি—সাধুর হৃদয় সকলের চেয়ে বড়।

ঈশান(সহাস্য) --সকলের চেয়ে বড় পৃথিবী, তার চেয়ে বড় সাগর, তার চেয়ে বড় আকাশ।

দিনপঞ্জিকা

২৮ চৈত্র, ভাঃ ২২ চৈত্র, **১২ এপ্রিল,** ২৮ চ'ত, সংবৎ ১১ বৈশাখ বদি, অধিক ২৪ রজব। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।২৫, সূর্য্যাস্তি ঘ ৫।৫৩। **বৃহস্পতিবার,** একাদশী দিবা ঘ ৬।১৮ মিঃ। শতভিষানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১।৫১ মিঃ। শুক্রযোগ শেষরাত্রি ঘ ৪।১৪ মিঃ। বালবকরণ, দিবা ঘ ৬।১৮ গতে কৌলবকরণ, রাত্রি ঘ ৬।৫০ গতে তৈতিলকরণ। **জন্মে**-- কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ রাক্ষসগণ ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, রাত্রি ঘ ১।৫১ গতে নরগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা। **মৃতে**-দোষ নাই, দিবা ঘ ৬।১৮ গতে একপাদদোষ, রাত্রি ঘ ১।৫১ গতে ত্রিপাদদোষ। **কালবেলাদি** ঘ ২।৪৬ গতে ৫।৫৩ মধ্যে। **কালরাত্রি** ঘ ১১।৩৯ গতে ১।৫ মধ্যে। **যাত্রা**— মধ্যম দক্ষিণে অগ্নিকোণে ও ঈশানে নিষেধ, দিবা ঘ ৬।১৮ গতে মাত্র দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ঘ ৩।৪৪ গতে নৈর্ঋতে অগ্নিকোণেও নিষেধ। **শুভকর্ম্ম**- দিবা ঘ ৬।১৮ গতে ২।৪৬ মধ্যে নামকরণ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যস্থাপন কারখানারম্ভ কুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটারনির্ম্মান ও চালন। **বিবিধ**— দ্বাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। **একাদশীর উপবাস (বরুথিনী)**। সায়ংসন্ধ্যা নিষেধ। **গোস্বামিমতে উন্মিলনীমহাদ্বাদশী ব্রত। গোস্বামিমতে ও নিম্বার্কসম্প্রদায়মতে অদ্য একাদশীর উপবাস। বাঁকুড়া জেলার ডিহিপাড়ায় শ্রীশ্রীমধুকেশ্বরজীউ শিবঠাকুরের গাজন আরম্ভ। মাহেন্দ্রযোগ**- দিবা ঘ ৭।৩ মধ্যে ও ১০।২২ গতে ১২।৫২ মধ্যে। **অমৃতযোগ**- রাত্রি ঘ ১২।৪৬ গতে ৩।৫ মধ্যে।

মুসলিম পঞ্জিকা

২৮ চৈত্র, ভাঃ ২২ চৈত্র, **১২ এপ্রিল,** ২৮ চ'ত ২৪ রজব উঃ ৫।২৫ অঃ ৫।৫৩ **বৃহস্পতিবার,** একাদশী দিঃ ঘঃ ৬।১৮।

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে,সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

আধুনিক কৃষির ক্ষতিকর প্রভাবে পরিবেশের দূষণ

ডা. সিতাংশু সরকার

শেষ পর্ব

কৃষকদের আর্থ-সামাজিক সমস্যার পাশাপাশি, সরকারি বা অ-সরকারি স্তরে কৃষি সম্প্রসারণে কর্মী সংখ্যার অপ্রতুলতাই মূলত দায়ী। কৃষকরা খানিকটা পুরোনো ধ্যান-ধারণার উপর নির্ভর করেই চাষ করেন। একথা জোরের সঙ্গে বলা যায়, চাষিরা যদি কেবলমাত্র সুপারিশমতো আধুনিক কৃষি পদ্ধতি মেনে ফসল উৎপাদন করেন, তবে ফলন যেমন ভালো হবে, সেই সঙ্গে সীমিত মাত্রায় কৃষি-বিষের প্রয়োগে দূষণও বিপদসীমা অতিক্রম করবে না। আধুনিক কৃষিতে যে সুসংহত রোগ-পোকা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার (Integrated Pest management বা IMP) কথা বলা হয়, তার স্পষ্ট ধারণা ও সঠিক ব্যবহার জরুরি। এই সুসংহত পদ্ধতিতে, কৃষি-বিষের ব্যবহারের আগে, চাষ পদ্ধতির দ্বারা নিয়ন্ত্রণের ধারণা মান্য হয়। এই ধারণায়, ফসলের কীটশত্রু ও রোগসহনশীল জাত নির্বাচন, বীজ লাগানোর সঠিক সময় নিরূপণ, সারি করে শস্য লাগানোর পদ্ধতি (যাতে ফসলের পল্লবাচ্ছাদনের ভিতরে যথেষ্ট আলো বাতাস প্রবেশ করতে পারে ও রোগ-পোকা অর্থনৈতিক ক্ষতির সীমার মধ্যে থাকে), মাটি পরীক্ষা করে ও নির্দিষ্ট ফসলের চাহিদা অনুযায়ী সারের মাত্রা নির্বাচন, সময়মতো আগাছা নিয়ন্ত্রণ, নিড়ানি দেওয়া ও মাটি আলগা করা, নিয়মিত জমি পরিদর্শন ইত্যাদির বিশেষ গুরুত্ব আছে। জমি পরিদর্শনের উপকারিতার এক উদাহরণ হল, পরিদর্শনের মাধ্যমে পাটের বিছা পোকা (Bihar Hairy Caterpillar) নিয়ন্ত্রণ। পূর্ণাঙ্গ স্ত্রী বিছা পোকা পাটের জমিতে আলের ধারের গাছের পাতাতেই একসঙ্গে অনেক ডিম পাড়ে এবং ওই পোকার শুককীটগুলি (লার্ভা) প্রথম অবস্থায় মাত্র গুটিকয়েক পাতাতেই সীমাবদ্ধ থাকে। চাষীরা যদি ওই লার্ভা-সহ কয়েকটি পাতা গাছ থেকে তুলে নষ্ট করে দেন, তাহলে সহজেই পাটের বিছা পোকা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং কোনোও কৃষি-বিষের প্রয়োজন হয় না। অনেক আগে থেকেই বিজ্ঞানীরা কীটশত্রু নিয়ন্ত্রণে আলোর ফাঁদ (Light Trap) ব্যবহারের কথা বলছেন। এর মাধ্যমে কৃষি-বিষের ব্যবহার অনেকটাই কমে যায়। কীটশত্রু নিয়ন্ত্রণের নতুন পরিবেশ-বান্ধব পদ্ধতির মধ্যে ফেরোমন ফাঁদ (Pheromone Trap) বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। এই পদ্ধতিতে বিশেষ প্রজাতির পোকার জন্য নির্দিষ্ট ফেরোমন হরমোন অতি অল্পমাত্রায় ফাঁদে ব্যবহৃত হয়। ফলে সেই নির্দিষ্ট প্রজাতির পুরুষ পোকা আকৃষ্ট হয় ও বিনষ্ট হয়, এবং স্ত্রী পোকা থেকে পরবর্তী প্রজন্ম তৈরি হতে পারে না । এই পদ্ধতি অনেক কীটশত্রু নিয়ন্ত্রণে (বিশেষত সবজি ও ফল চাষে) খুবই ফলপ্রসূ এবং পরিবেশে কৃষি-বিষের ভার চাপায় না । যেকোনো ফসলের বীজ বোনার বা লাগালোর আগে অবশ্যই বীজ শোধন করতে হবে। এতে খুবই সামান্য পরিমানে রাসায়নিক ব্যবহার করে অনেক রোগের আক্রমন থেকে ফসলকে, অতিরিক্ত কৃষি-বিষ ব্যবহার না করেই বাঁচানো যায়। তা ছাড়া জমিতে বিভিন্ন প্রকার জীবাণু সারের ব্যবহারের সুপারিশ করা হয়। জীবাণু সার মাটির উর্বরতা বৃদ্ধির পাশাপাশি অনেক রোগ-পোকা নিয়ন্ত্রণের কাজও করে। জমিতে কোনোও রোগ-পোকার আক্রমণ হবার সঙ্গে সঙ্গে রাসায়নিক কৃষি-বিষ প্রয়োগ করা উচিত নয়। প্রথমেই জমি পরিদর্শনে গিয়ে আক্রমণের মাত্রা বা গতি একক পরিমাণ জমিতে ওই নির্দিষ্ট রোগ বা পোকার সংখ্যা ক্ষতিকর সীমা অতিক্রম করেছে কি না তা দেখতে হবে। যদি তা ক্ষতিকর সীমা লঙ্ঘন করে, তবে সেই রোগ বা পোকা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। অনেক ক্ষেত্রেই রাসায়নিক কৃষি-বিষের পরিবর্তে নিম তেল ব্যবহার করে সুফল পাওয়া যায়। নিম তেল এখন সহজেই বাজারে মেলে অথবা চাষিরা নিজেরাও নিম ফল থেকে কীটনাশক তৈরি করে নিতে পারেন। জৈব কীটনাশকের মাত্রা বাড়িয়েও যদি কীটশত্রু নিয়ন্ত্রিত না হয়, তবে সুপারিশ অনুসারে রাসায়নিক কৃষি-বিষ ব্যবহার করা উচিত। কৃষি-বিষ যদি নির্দিষ্ট মাত্রায় এবং সঠিক পদ্ধতিতে প্রয়োগ করা হয়, তবে তা পরিবেশকে খুব বেশি দূষিত করে না। এক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে, জমিতে শত্রু পোকার পাশাপাশি অনেক প্রজাতির বন্ধু পোকাও থাকে, ফলে প্রায়শই শত্রু পোকার সংখ্যা ক্ষতিকর সীমা পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে না। অকারণে কম সংখ্যার শত্রু পোকা মারার জন্য কৃষি-বিষ প্রয়োগ করলে, উপকারি পোকাগুলিও মরে যাবে এবং জমিতে পোকার স্বাভাবিক ভারসাম্য বিঘ্নিত হবে। এর পরে যে বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে তা হল, সুসংহত উদ্ভিদ খাদ্য যোগান ব্যবস্থা (Integrated Nutrient Management বা INM)। জমিতে কেবলমাত্র সার প্রয়োগ করলে, জমির উর্বরতা শক্তি বেশি দিন স্থায়ী হয় না। তাই সুষম রাসায়নিক সারের সঙ্গে সুপারিশ মতো জৈবসারও যোগান দিতে হবে। গোবর সার, কেঁচো সার, সবুজ সার, খইল, জীবাণু সার ইত্যাদি জৈব সার হিসবে সুপারিশ করা হয়।

নাইট্রোজেন আবদ্ধকারী জীবাণু, যেমন--অ্যাজোটোব্যাকটার, রাইজোবিয়াম, অ্যাজোস্পাই রিলাম ইত্যাদি এবং ফসফেট দ্রবণক্ষম জীবাণু বা ফসফোব্যাকটার ব্যবহারে জমির উর্বরতাশক্তি দীর্ঘ সময়ের জন্য উচ্চ ফলনক্ষম থাকে। এই জীবাণু সারের প্রয়োগের ফলে, জমিতে নাইট্রোজেন ঘটিত রাসায়নিক সারের মাত্রা অনেক কম হলেও ভালো ফলন পাওয়া যাবে। ফলে রাসায়নিক সারের সীমিত ব্যবহার পরিবেশকে দূষিত করবে না। এই আলোচনার আগের অংশে আর্সেনিক দূষণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর্সেনিকের ক্ষতিকর প্রভাব কম করতে নিয়মিত জৈব সার, পোল্ট্রি সার, নিম, খইল ইত্যাদি জমিতে ব্যবহারের সুপারিশ করা হয়। এছাড়াও নীল-সবুজ শৈবাল (Blue-green algae), অ্যানাবেনা, নস্টক এবং আরো কিছু উপকারী জীবাণু জমিতে আর্সেনিকের দূষণ কম করতে পারে। আগেই বলা হয়েছে, অদূরদর্শী ও অসংযতভাবে ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলনের ফলে আর্সেনিক দূষণ এতো ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। তাই কৃষিতে দূষণ কমাতে কার্যকর ও দক্ষ সেচ ব্যবস্থার গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। ভূগর্ভস্থ জলের উপর নির্ভরশীলতা কম করতে বৃষ্টির জলের সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবহার (Rain water harvesting) বাড়াতে হবে। তাছাড়া অনেক ফসলেই প্লাবন সেচের (Flood water haevesting) পরিবর্তে ঝারি/ফোয়ারা সেচ (Sprinkler irrigation) ও ফোঁটা সেচ (Drip irrigation) দিলে অসুবিধে নেই। ফলে জলের অপচয় কম হবে এবং জলের লিটার প্রতি অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতাও বৃদ্ধি পাবে। রোয়া ধানের ক্ষেত্রে এখনও চাষিরা জল দাঁড় করিয়ে রাখেন, এই পদ্ধতির আর প্রয়োজন হয় না। পরীক্ষায় প্রমাণিত, ধানের খেতে নির্দিষ্ট মাত্রার ভেজা ভাব বা জল দ্বারা মাটির সংপৃক্ততা (Soil saturation) থাকলেই তা ধানের উচ্চ ফলনের জন্য অনুকূল, দাঁড়ানো জলের প্রয়োজন হয় না। ইতোমধ্যেই চাষিরা শ্রী-পদ্ধতিতে (SRI) অল্প জল ব্যবহার করেই ধানের ভালো ফলন পাচ্ছেন, এটা আশার কথা। যে অঞ্চলে জলের অপ্রতুলতা আছে বা ভূগর্ভস্থ জল থাকলেও তা আর্সেনিক বা ওই ধরনের কোনো দূষণের শিকার, সেক্ষেত্রে ধানের পরিবর্তে চাযের জন্য অন্য ফসল নির্বাচন করতে হবে। যেমন যেগুলির জলের চাহিদা কম, বিশেষত, ডালশস্য এবং বেশ কিছু তৈলবীজে সেচের প্রয়োজনীয়তা অনেক কম। ধান চাষে প্রয়োজনীয় জলের পরিমান ১২০০ মিলিলিটার, কিন্তু ছোলা চাষে মাত্র ২৫০ মিলিলিটার জল লাগে। অর্থাৎ ১ হেক্টর ধান চাষে সম পরিমান জল দিয়ে ৪.৮ হেক্টর ছোলা চাষ করা যাবে। তাই শস্য পর্যায়ে এই ধরনের কম জলের ফসলের অন্তর্ভুক্তির কথা ভাবতে হবে।

উচ্চ উৎপাদনমুখী কৃষিতে যে বিপুল পরিমান ফসলের অবশেষ তৈরি হয়, তার দ্রুত ও সুষ্ঠু ব্যবহার জরুরি। অন্যথায় চাষিরা এইগুলি পোড়ানোর ফলে বায়ু দূষণ চলতে থাকবে। পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ ও রাজস্থানে ফসলের অবশেষ পোড়ানোর প্রচোলন বেশি। বেশ কিছু দিন আগে থেকেই ফসলের অবশেষ ব্যবহারের বিষয়ে গবেষণা চলছে এবং কিছু ক্ষেত্রে সাফল্যও পাওয়া গেছে। ধানের খড়কে এক ধরনের জীবাণুর (Enterobacter) দ্বারা জৈব-হাইড্রোজেন তৈরিতে চিন সাফল্য পেয়েছে। ধান ও গমের খড় সহজে পচে না, ফলে জৈব সার তৈরিতে দেরি হয়, কিন্তু শিম্ব গোত্রীয় (ডাল শস্য) ফসলের অবশেষ থেকে সহজেই জৈব সার তৈরি হতে পারে। প্রথাগত কর্ষণের মাধ্যমে চাষ ছাড়াও, সংরক্ষিত চাষ (conservation tillage) বা শূন্য কর্ষণ (Zero tillage) চাষের মাধ্যমেও বেশকিছু ফসল ফলানো যেতে পারে। এক্ষেত্রে জমিতে থাকা আগের ফসলের শেষাংশ সরিয়ে ফেলতে হয় না এবং এই অবস্থাতেই পরের ফসল লাগানো যায়। ফসলের অবশেষ অনেকভাবে অন্য ফসলের জমির মাটির আচ্ছাদন (Mulching) হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। ফসলের অবশেষ ঠিকভাবে ব্যবহৃত হবার জন্য, শূন্যকর্ষণ বীজ বপন যন্ত্র (Zero till seed drill), অবশেষ কাটার যন্ত্র (Straw Chopper) অবশেষ বাঁধার যন্ত্র (Straw bailer) সম্পর্কে চাষিদের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে, যা ইতোমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। এই যন্ত্রগুলি কীভাবে ব্যবহার করতে হবে তার প্রশিক্ষণের জন্য সরকার হেক্টর প্রতি ৪,০০০ টাকা অর্থ সাহায্য দিচ্ছে। বর্তমান অর্থ বছরে (২০১৭-'১৮) ফসলের অবশেষ যাতে সঠিকভাবে ব্যবহৃত হয়, তার জন্য পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ ও রাজস্থানের জন্য যথাক্রমে ৪৮.৫, ৪৫, ৩০ এবং ৯ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে।

আরও কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ জোর দিতে হবে। যথাসম্ভব জৈব চাষকে অগ্রাধিকার দিতে হবে, তবে খেয়াল রাখতে হবে যে, জাতীয় স্তরে এর ফলে মোট উৎপাদনে ঘাটতি যেন না হয়। বিভিন্ন সম্প্রসারণ ব্যবস্থার মাধ্যমে এবং গণমাধ্যমের দ্বারা কৃষি-বিষের সম্পর্কে চাষিদের, এমনকি সাধারণ নাগরিকদের মধ্যেও সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। অনেক সময় দেখা যায়, কোনও ফসলের মোট উৎপাদন কোনও বিশেষ বছরে অনেক বেশি হওয়ার ফলে, ফসলের অপচয় হয়; এই অতিরিক্ত ফলন ফলাতে গিয়েও কৃষি-বিষ প্রযুক্ত হয় ও পরিবেশের ক্ষতি বাড়িয়ে দেয়। তাই ফসলের উৎপাদনে জাতীয় স্তরে পরিকল্পনার মাধ্যমে স্থিতিশীলতা আনতে হবে। উৎপাদিত ফলনকে সরকারি স্তরে এবং বেসরকারি স্তরে সুনির্দিষ্ট সংরক্ষণ ব্যবস্থার আওতায় আনতে হবে। উৎপাদিত ফসলের দ্রুত ও কার্যকর বন্টন ব্যবস্থা থাকতে হবে, যা অনেক সময়ই বেশি উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করে এবং পরোক্ষভাবে কৃষি-বিষের দূষণ কমাতে সাহায্য করে। সর্বোপরি সরকারি জাতীয় নীতি নির্ধারক স্তরে প্রকৃত সদিচ্ছা এবং কৃষক ও সাধারণ মানুষের মধ্যে এই দূষণ ও পরিবেশ সচেতনতা অবশ্যই কৃষি-বিষের দূষণ ন্যূনতম করতে সক্ষম হবে।

"যাদের শুচিবাই, তাদের মধ্যে ঈশ্বরচিন্তা ঢোকা বড় কঠিন"

দুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায়

> *"ব্রহ্মচারিগতং ভৈক্ষ্যং নিত্যং মেধ্যমিতি স্থিতিঃ।*
> *...প্রচ্ছন্নপাপা জপ্যেন তপসা বেদবিত্তমাঃ।*
> *ক্ষান্ত্যা শুধ্যন্তি বিদ্বাংসো দানেনাকার্যকারিণঃ।।"*
> —মনু সংহিতা ৫/১২৯, ১০৭

—জলে শরীর, সত্যকথায় মন, বিদ্যা ও তপস্যায় জীবাত্মা, জ্ঞানের দ্বারা বুদ্ধি শুদ্ধ হয়; ভূমিগত জল, পতিব্রতা নারী, ধর্মপরায়ণ রাজা এবং ব্রহ্মচারি সদাশুচি; ব্রহ্মচারির ভিক্ষান্ন নিত্যপবিত্র; গুপ্তপাপিগণ জপের দ্বারা, বেদবিদ্গণ তপস্যার দ্বারা, বিদ্বানগণ ক্ষান্তির দ্বারা এবং অকর্মা ব্যক্তিগণ দানের দ্বারা শুদ্ধ হন। মনু (৫/১০৯) বলেছেন, ''অদ্ভি গাত্রানি শুধ্যান্তি মনঃ সত্যেন শুধ্যতি। বিদ্যাতপোভ্যাং ভূতাত্মা বুদ্ধির্জানেন শুধ্যতি।" যম বলেছেন, ''শুচি ভূমিগতং তোয়ং শুচিনারী পতিব্রতা। শুচি ধর্মপরো রাজা ব্রহ্মচারি সদাশুচিঃ।।" বোধায়ন ধর্মসূত্র (৯/৮/৩) বলেছেন, ''অন্ত- শৌচং মনঃ শুদ্ধিঃ।"

শুচি'র মানে হল--শুদ্ধ, পবিত্র, নির্দোষ, শুভ্র। আর 'শুচিবাই'-এর মানে হল—শুচিতা রক্ষার বাতিক, শুচি-বাতিক। ভক্তদের কাছে শুচিতা, পবিত্রতা ইত্যাদি শব্দগুলি অতি পরিচিত। মূল কথা হল--সর্বত্র নিষ্ঠা, পবিত্রতা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা। ভোগ রান্নার জিনিসপত্র, হাঁড়ি, কড়া, থালা-বাসন, আনাজ-সবজি ভালোভাবে ধোয়া খুবই জরুরি। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে অনেক শুচিবাইগ্রস্ত বাড়াবাড়ি করার স্বীকার হন। তাঁদের উদ্দেশ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন—''শুচিবাই ছেড়ে দাও। যাদের শুচিবাই, তাদের জ্ঞান হয় না। আচার যতটুকু দরকার ততটুকু করবে। বেশি বাড়াবাড়ি করো না (কথামৃত ৪/৮/২)।"

'শুচিবাই'-এর নানা দৃষ্টান্ত আছে--প্রাচীনপন্থী মেয়েরা এঁটো-সক্‌ড়ি খুব মানেন। সেই ক্ষেত্রে ধোয়াধুয়ির একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। বার বার হাত ধোয়া, বার বার স্নান করা, বাড়িতে কেউ এসে তিনি চলে যাওয়ার পর গোবর জল ছেটানো, কোনকিছু খাওয়ার পর ন্যাতা দিয়ে সক্‌ড়ি নিকানো, নিকৃষ্ট কিছু ছোঁয়া গেলে স্নান করা ইত্যাদি। বার বার হাত ধোয়ার ফলে হাতে হাজা হয়ে গেলেও হাতধোয়া ছাড়তে বা কমাতে পারেন না। বার বার স্নান করার ফলে সর্দি বা জ্বর হলেও স্নান করা ছাড়তে পারেন না। এরা সবাই শুচিবাইগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমা বলেছিলেন--''মানুষ স্বভাব ছাড়তে পারে না।"

১৩২০ সালের ৩০শে আষাঢ়ের ঘটনা—নলিনীদিদি ভিজে কাপড়ে এসে বললেন--তাঁর কাপড়ে কাকে প্রস্রাব করেছে, তাই আবার স্নান করে এসেছেন। তখন শ্রীশ্রীমা বললেন —''বুড়ো হতে চললুম, কাকে প্রস্রাব করে কখনোও শুনিনি। বহু পাপ, মহাপাপ না হলে কি মন অশুদ্ধ হয় ? শুচিবাই। মন আর কিছুতেই শুদ্ধ হচ্ছে না ... আর শুচিবাই যত বাড়বে, ততই বাড়বে। সবই যত বাড়বে, তত বাড়বে।" অন্য একসময় (১৯১২, জুলাই) শ্রীশ্রীমা নলিনীদিদিকে বলেছিলেন, ''আমি তো দেশে কত শুক্‌নো বিষ্ঠা মাড়িয়ে চলেছি। দুবার 'গোবিন্দ গোবিন্দ' বললুম, ব্যস্ সব শুদ্ধ হয়ে গেল। মনেতেই সব, মনেই শুদ্ধ, মনেই অশুদ্ধ।" শ্রীশ্রীমা বলেছিলেন--''মনই শুচি-অশুচি। বাইরে অশুচি বলে কিছু নেই (মায়ের কথা ২/২৫০)।"

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, ''মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত (কথামৃত ১/২/৫)।" আবারও বলেছিলেন—''শুচি-অশুচি—এটি ভক্তি ভক্তের পক্ষে। জ্ঞানীর পক্ষে নায় (কথামৃত ৩/১৭/১)।" 'শুচিবাই' প্রসঙ্গে বলেছিলেন--''শুচিবাইগ্রস্ত লোকেদের কেবল অশুদ্ধ বিচার করতে গিয়ে সর্বদা একটা অশুচির ভাব থেকে যায়। ...যাদের শুচিবাই, তাদের মধ্যে ঈশ্বরচিন্তা ঢোকা বড় কঠিন।" তাই শুচিতা রক্ষার বাতিককে কাটিয়ে উঠতেই হবে। সবসময় ভাবতে হবে নিজের দেহ শুধু নয়, মন ও অন্তর শুদ্ধ ও পবিত্র করেই শ্রীভগবান আমাদেরকে পাঠিয়েছেন।

সম্পাদক সমীপেষু

সংসারের বোঝা

সংসার মানে, সং সাজতে পারলেই তবে সংসারটাকে চালাতে পারবে। সারমর্ম কিছুই নেই তবুও সং সাজতেই হবে। তবেই সংসার কথাটা পাবে। সংসার মানেই বোঝা। আর এই বোঝা টানা বড় দায়। সংসার মাথায় নিয়ে চলাটাও কঠিন। কারণ বোঝাটা মাথায় এসে যায়। নুন আনতে পান্তা ফুরিয়ে যায়। এই অবস্থায় নিজেকে বড্ডো বেশি করুণ মনে হয়। কেন সংসারের মায়াজালে জড়িয়ে পরলাম ! তার চেয়ে একা থাকলে ভাল হত, এত সমস্যা মাথায় নিতে হতো না। বর্তমানে আরেকটা বোঝা এসেছে, সেটা কানেতে নিতে হচ্ছে। কানটা শোনার জন্যই মানবদেহে রয়েছে। সেই কান আজ প্রায় বন্ধই হয়ে গেছে। রাস্তাঘাটে, বাসেট্রামে, ট্রেনে যেখানেই থাকি না কেনো, একটা ছবি দেখতে পাই। বেশির ভাগ পুরুষ ও নারীরা টেথিস্কোপের মতো দুটো তার কানেতে গুঁজে দিয়েছে। সেই তার মোবাইলে এসেছে। মোবাইল অন করে দেওয়া হয়েছে, সেই মোবাইল থেকে গান শোনা যাচ্ছে। এবং ঘন্টার পর ঘন্টা চলছে এই কাজ। যা তার শুনতে খুব ভাল লাগছে। সে এক মনে শুনে যাচ্ছে। এর পর বাস থেকে নেমে বা ট্রেন থেকে চলেছে তার বাড়ির দিকে। তখনও কানেতে টেথিস্কোপটা লাগানো রয়েছে। পাশদিয়ে একটা এক্সপ্রেস ট্রেন এগিয়ে আসছে হর্ণ দিয়ে। সেই শব্দও কানেতে পৌঁছাতে পারলো না। ট্রেনটা তার নিয়ম মেনেই চলে গেল। একটা গানের চিপ, যাতে অনেক গান ধরে রাখাছিল, সেই গানগুলো কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই মুছে গেল। ওই চিপে আর কোনো গান লোড করা যাবে না। চিপটাই যে শেষ হয়ে গেছে। এটা কাদের বোঝা হয়ে দাঁড়ালো? এটা সেই সংসারেরই বোঝা হয়ে গেল। যদি কানটাকে খোলা রাখতে পারতাম, তবে জীবনে আরও অনেক গান শুনতে পেতাম। অনেক কথা শুনতে পেতাম। এভাবে পরিসমাপ্ত হয়ে যেত না। কানটাকে খোলা রাখতে পারলে, আমি গানে গানে কণ্ঠ মিলিয়ে গাইতে পারতাম, মা-মাগো মা/আমি এলাম তোমার কোলে/তোমার ছায়ায় তোমার মায়ায়/ মানুষ হবো বলে।

বিবেক রায় দে, হাওড়া

উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণরূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য 'আর্থিক লিপি' কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।
সম্পাদক

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বাদলের বিরুদ্ধে নয়।............সম্পাদকীয় দফতর।

লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২

পাঠকের দরবারে

চিঠি পাঠান
লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়